প্রত্যাবর্তন

(গল্পগ্রন্থ – নীলগঞ্জের ফালমন্ সাহেব)

মাথাটা আগে থেকেই ঝিমঝিম করছিল। আবার বোধ হয় জ্বর আসচে।

পাল্লা-হরিশপুরের মাইনর স্কুলে পড়ি। বাবার হাতে পয়সা নেই, মা কান্নাকাটি করেন, ছেলেটার লেখাপড়া হল না—তাই পাল্লা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ষড়ানন চাটুজ্যে আমার সাবেক স্কুলের মাস্টার মহাশয়ের অনুরোধে পাল্লার মাইনর স্কুলে বিনা মাইনেতে পড়তে দিয়েচেন। গ্রামের পুরুতঠাকুর শ্রীগোপাল চক্কত্তি দয়া করে তাঁর বাড়িতে আমার খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করেচেন। আমি এখানে আজ বছরখানেক হল।

থাকতে পারিনে ভালোভাবে দু'কারণে। সে কথা কেউ জানে না, মা জানতো, কিন্তু মা তো এখন নেই এখানে।

প্রথম—ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগছি আজ একটি বছর। কত ওষুধ খাচ্ছি কিছুতেই সারে না।

দ্বিতীয় কারণটা—আমার ছোট ভাই দেশে আছে, তার নাম নন্তু। বড় চমৎকার ছেলে সে। সাত বছর হল। আগে আমায় ডাকতো— 'তাতা-ও তাতা।'—এখন 'দাদা' বলেই ডাকে। সুন্দর দেখতে। নন্তুকে না দেখে বড় কষ্ট হয়।

সেদিন টিফিনের ছুটি হবার আগেই মাস্টারমশাইকে বলি—স্যার, আমার জ্বর আসচে—

ননী মাস্টার আমার দিকে চেয়ে সহানুভূতির সুরে বললেন—আবার জ্বর?

—হ্যাঁ, স্যার।

—বাড়ি যাবি?

—এখন হাঁটতে পারব না, স্যার।

—বেঞ্চিতে শুয়ে পড়। আয় দিকি হাত দেখি—

হাত দেখতে হল না, গায়ে হাত দিয়েই বললেন— এঃ, বড্ড জ্বর যে। গা পুড়ে যাচ্চে। শুয়ে পড়।

শুয়েই পড়ি বেঞ্চিতে।

তারপর জ্বরে কখন অজ্ঞান হয়ে গিয়েচি। যখন জ্ঞান হল তখন আমতলার স্কুলবোর্ডিংয়ে আমাদের ক্লাসের গোপালের তক্তপোশে শুয়ে আছি।

গোপাল আমার পাশে দাঁড়িয়ে, বললে—কেমন আছিস বিনোদ?

সে কোথা থেকে দৌড়ে এসেচে। গায়ে ঘাম, মুখ রোদে রাঙা হয়েচে। বললাম—দৌড়ুচ্ছিলি?

—হাঁ, ষাঁড় তাড়াচ্ছিলাম—হেডমাস্টারের কপিক্ষেত সাবাড় করেচে।

—আমার গায়ে হাত দিয়ে দ্যাখ—জ্বর আছে?

—হুঁ, বেশ আছে। বাড়ি যাবিনে?

—হাঁটতে পারলেই যাবো।

—তাই যা। এবারে শোবার জায়গা নেই, কোথায় থাকবি? বাড়ি যা।

বাড়ি যাবো কোথায়, তাই ভাবি। এ আমার নিজের বাড়ি নয়। যাঁর বাড়ি থাকি, তিনি বাড়ি-বাড়ি ঠাকুরপুজো করে বেড়ান। তাঁর বাড়িতে খুব খাটতে হয় আমাকে, তাঁর ছোট মেয়েটাকে সর্বদা কোলে করে বসতে হয়। একটু যদি কেঁদে ওঠে খুকি, তার মা আমার উপর চটে যান।

একদিন মনে আছে, স্কুল থেকে বাড়ি গিয়েচি, খিদেয় সমস্ত শরীর হালকা হয়ে গিয়েচে, খুকিকে আমার কোলে দিয়ে তার মা রান্নাঘরে ঢুকলেন। আমি আসবার আগে থেকেই খুকি কাঁদছিল। আমার কোলে উঠে আরো কাঁদতে লাগলো। আমি কত বোঝালাম, কত ছড়া বললাম, গান গাইলাম, কিছুতেই শুনল না, কান্নাও

থামলো না। ওর মা এমন রেগে গেলেন আমার ওপর, আমার কাছ থেকে খুকিকে নিয়ে নিজে কোলে করে বসলেন। আমায় কিছু খেতে দিলেন না। রাত্রেও আমাকে ভাত দিতেন না বোধ হয়— রাত্রে চক্কত্তি মশায় খেতে বসে বললেন—বিনোদ খেয়েচে?

তখন কত রাত হয়ে গিয়েচে। খিদেয় অবসন্ন হয়ে পড়েচি। স্কুল থেকে এসে পর্যন্ত একগাল মুড়িও খাইনি।

অন্যদিন এমন সময় কোন কালে আমার খাওয়া হয়ে যায়। পুরুত মশায় নবীন দাঁর চণ্ডীমণ্ডপের দাবা-খেলার আসর থেকে রোজই বেশি রাত করে ফেরেন। তারপর তিনি খেতে বসেন।

খুকির মা বললেন—না।

পুরুত মশায় বললেন—কেন? এত রাত্রেও খায়নি এখনো? জ্বর হয়েচে বুঝি?

—না, জ্বর হবে কেন? বসে পড়ছিল, তাই ভাত দিইনি এখনো।

—যাও, ডেকে দাও। ছেলেমানুষ খিদে পেয়েচে, আমার পাশেই বসুক।

—তুমি খেয়ে উঠে যাও, দেবো এখন।

—না, ওকে ডাকো। জায়গা করে দাও এপাশে।

পুরুত ঠাকুরের কথায় আমার জায়গা করে দিলেন খুকির মা। নয়তো আমি জানতাম, রাত্রে তিনি আমায় না খাইয়ে রেখে দিতেন। কাউকে কিছু বলা আমার স্বভাব নয়, চুপ করেই থাকতাম।

সেই বাড়িতেই ফিরে যাওয়ার কথা বলচে গোপাল!

সেখানে আমার মা নেই। মা থাকলে—আমায় দেখলে রাস্তা থেকে ছুটে আসতেন। এখানে খুকির মা আমার জ্বর দেখলেই মুখ ভার করে বলবে—ওই এলেন অসুখ নিয়ে! কে এখন সেবা করে? আমার তো বড্ড উপকার হচ্ছে ওঁকে দিয়ে! কুটোটুকু ভেঙে দু'খানার উপকার নেই, শুধু সেবা করো—বার্লি রে—সাবু রে—

কিছুই করতে হয় না ওঁকে। আমি ওঁকে কখনো কষ্ট দিইনে। আমার রোজ জ্বর লেগেই থাকে। ওঁকে ডাকতে বা কিছু বলতে আমার লজ্জা হয়। উনিও আমার কাছে বড় একটা আসেন না। মিথ্যে বলব না, সে বরং পুরুত মশাই যত রাত্রেই ফিরুন না দাবা খেলে, আমার অসুখ হয়েছে শুনলে আমার শিয়রে এসে বসে আমার হাত দেখবেন, গায়ে হাত দিয়ে জ্বর দেখবেন। স্ত্রীকে ডেকে বলবেন সাবু কি বার্লি করে দিতে। নিজে কাছে বসে খাওয়াবেন। সকালে উঠে গোবিন্দ ডাক্তারকে গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন ব্যস্ত হয়ে—ও ডাক্তারবাবু, বিনোদ যে অমন ভুগতে লাগলো! পরের ছেলে আমার বাড়ি আছে, অমন করে থাকলে মন বড় ব্যস্ত হয়। ওর অসুখের একটা বিহিত করুন।

পুরুত মশাইকে দেখলে বাবার কথা মনে পড়ে। দুজনেই নিরীহ; কেউ ওঁদের মানে না, বরং ওঁরাই সবাইকে ভয় করে চলেন।

বড় যদি হই, পুরুত মশাইয়ের দুঃখু আমি ঘোচাবো। ওঁর ছেলে নেই। আমি ওঁর ছেলে হবো। না, ওঁদের বাড়ি আমি এখন যাবো না। জ্বর আমার এবার খুব বেশি। হয়তো আরো বাড়বে।

গোপালকে আমি বললাম—ভাই, আমি মার কাছে যাবো।

—মার কাছে যাবি! তোদের গাঁয়ে? সে এখান থেকে ছ' কোশ রাস্তা। নদী পার হতে হবে কেউটেপাড়ার খেয়াঘাটে—পারবি কেন? এই জ্বর-গায়ে—

—তা হোক। তুই কাউকে বলিসনে। আমার পকেটে সরকারি ডাক্তারখানার ওষুধ আছে। আমি যাবো। রাত্তিরটুকু তোর খাটে থাকতে দে।

গোপাল রেগে গেল। বললে—দায় পড়েছে তোকে থাকতে দিতে। তোর যত বাজে আবদার। বাড়ি যাবি কী করে এই অসুখ গায়ে? বাড়ি যাবি বললেই হল? আমারও খাটে নেই জায়গা। দুজনে শোবো কোথায়? আমি রুগীর সঙ্গে এক বিছানায় শুইনে। বাড়ি যা।

মনে বড় দুঃখু হল, গরিব বলে সবাই হেনস্তা করে। গোপাল যে আমার এই অসুখ-গায়ে তাড়িয়ে দেবে, তার মানেও তাই।

আমি বাইরে এসে দাঁড়ালাম। বেলা এখনো ঘণ্টা-দুই আছে। শরীরটা একটু হালকা মনে হচ্চে। এই দু ঘণ্টা হাঁটলে কেউটেপাড়ার খেয়াঘাট পর্যন্ত পৌঁছতে পারবো না? খুব পারবো। খেয়াঘাটের ইজারাদার যে ঘরে থাকে, বললে আমাকে জায়গা দেবে না একটু? গোপালের মতো নিষ্ঠুর তারা নয়। পুরুত ঠাকুরের বৌয়ের মতো নিষ্ঠুর তারা নয়।

—আচ্ছা ভাই, চললাম।

বলেই রওনা হলাম বোর্ডিং থেকে। লুকিয়ে মাঠের রাস্তা ধরলাম। আমি জানি, আমি বেশিদিন বাঁচবো না। মাকে আমার দেখতেই হবে। কারো কাছে যাবো না, মার কাছে যাবো।

চৈত্র মাস। অথচ এমন শীত করে এখনো! বেলা খুব বেড়েচে। মেঠো পথের দু'ধারে ঘেঁটুফুল ফুটেচে কত!

বাঘজোয়ানির ঠাকুরবাড়ি পার হয়ে ফলেয়া গ্রামের পথে পড়ে ছোট্ট খালের খেয়া। একখানা নৌকো আছে। মাঝি থাকে না, নিজেই নৌকো বেয়ে পার হয়ে ওপারে শিমুলতলায় বসি। শিমুলফুল ফুটেচে গাছটাতে, টুপটাপ করে রাঙা ফুল ঝরে পড়চে। শুকনো কঞ্চির বেড়া দিয়েচে পোড়া খালের ধারে ধারে। চাষাদের মুসুরি-ক্ষেতে মুসুরি পেকে গাছ শুকিয়ে গিয়েছে, কিন্তু এখনো মুসুরি তোলেনি। ঘেঁটুফুলের কী সুন্দর সুগন্ধ বেরুচ্চে পড়ন্ত রোদে! নিঃশ্বাস টেনে শুঁকি।

কেবলই হাঁটছি, কিন্তু হাঁটতে পারিনে আর। পা ধরে আসচে। ফলেয়া গ্রামের পেছনে মস্ত বাঁশবাগানে মরা শুকনো বাঁশপাতার কেমন চমৎকার গন্ধটা! বাঁশবাগানের মধ্যে দিয়ে পথটা, তারপর আবার মাঠ। মাঠের মধ্যে বড় একটা যজ্ঞিডুমুর গাছ। থোলো থোলো যজ্ঞিডুমুর পেকে টুপটুপ করচে গাছে। আমার গা বমি-বমি করছিল। ডুমুরতলায় বসে বমি করলাম। গা কেমন ঝিমঝিম করতে লাগলো। জলতেষ্টা পেলো। ঠান্ডা জল কোথায় পাই?

অবসন্ন হয়ে থাকলে চলবে না, মার কাছে পৌঁছতে হবে। কখনো একা এত দূর পথ হাঁটিনি। ভয় করচে। অন্য কিছুর ভয় আমার নেই। চিলতেমারি গ্রামের শ্মশানটা রাস্তার ধারেই পড়ে। শ্মশানে নাকি কত লোক ব্রহ্মদত্যি দেখেচে, পেতনী দেখেচে। চিলতেমারি যেতে অবিশ্যি সন্ধে হবে না। হে ভগবান, যেন সন্ধ্যা না হয়। মাকে দেখতেই হবে। তার আগে যেন সন্ধ্যা না হয়, অথবা না মরি, হে ঠাকুর!

একটা কাদের বাড়ি পথের ধারে। দরজায় দাঁড়িয়ে বললাম—একটু জল দেবে?

একটা দশ-বারো বছরের মেয়ে আমার সামনে এসে —কী জাত?

—ব্রাহ্মণ।

—আমাদের জল খাবে? আমরা জেলে।

—তা হোক, দাও।

মেয়েটি একটু পরে একখানা পাটালি আর এক ঘটি জল নিয়ে এসে আমায় দিলে। আমার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখে বললে—তোমার কী হয়েচে?

—জ্বর।

—কোথায় বাড়ি?

—মনোহরপুরে। পাটালি খাবো না, শুধু জল দাও।

জল খেয়ে আমি হেঁটে চললাম অতি কষ্টে। মেয়েটা আমার দিকে আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইল কতক্ষণ। সে বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল আমার হাঁটতে কষ্ট হচ্চে। সে চেঁচিয়ে বললে—আজ এখানে থেকে গেলেই পারতে—হ্যাঁগো !

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম—না, আমাকে যেতেই হবে, মার জন্যে মন কেমন করচে।

আবার মাঠ। কী সুন্দর মাঠ! শুধু আকন্দ ফুল আর ঘেঁটুফুল ফুটে আছে। যদি শরীর ভালো থাকতো, হয়তো মাঠে হাডুডু খেলতাম বন্ধুদের নিয়ে। সূর্য অস্ত যাচ্চে। এখনো সামনে চিলতেমারি গ্রাম, তারপর কেউটেপাড়ার খেয়াঘাট—যমুনা নদীর ওপর। সন্ধে হলেই আমার ভয় করবে। চিলতেমারির শ্মশান তার আগেই পেছনে ফেলতে হবে; কিন্তু আর যেন হাঁটতে পারচিনে, শরীর কেমন করচে!

একটা তুঁতগাছের তলায় গুঁড়ি ঠেস দিয়ে বসে দম নিই। সূর্যটার দিকে চেয়ে দেখি। সূর্য ডুবলেই অন্ধকার হয় না। ভরসা একেবারে ছাড়িনি। আচ্ছা, তুঁততলায় যদি আর খানিকটা বসি? না, তা হলে কেউটেপাড়ার খেয়াঘাটে পৌঁছতে পারবো না। আবার জ্বর আসবে নাকি? শীত করচে আবার!

এক দাগ ওষুধ পকেট থেকে বের করে নাক টিপে খেয়ে নিলাম। বিকট তেতো কুইনিন মিকচার। মা সুপুরি কেটে দেবে বাড়িতে, তখন শুধু মুখে আর ওষুধ খেতে হবে না।চিলতেমারি ছাড়লাম প্রাণের দায়ে জোর হেঁটে। শ্মশান-রাস্তার বাঁ-দিকে তেলাকুচো আর গোয়ারি গাছের নিবিড় ঝোপে অন্ধকার হয়ে আসচে। আড়চোখে একবার চেয়ে দেখে সন্তর্পণে রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছি।

কে যেন বলে উঠলো, পারবিনে তুই মায়ের কাছে যেতে। আমরা তোকে যেতে দেবো না। তোকে এই শ্মশানেই রাখবো।

দূর, ওসব মনের ভুল! রাম রাম, রাম রাম— এখনো অন্ধকার হয়নি। অন্ধকার না হলে ওসব বেরুতে পারে না। রাম-নামে ভূত পালায়।

সত্যি, আর কিন্তু হাঁটতে পারচিনে। কেউটেপাড়া এখনো কত দূর। ওই দূরে বাঁশবন দেখা যাচ্চে কেউটেপাড়া গ্রামের। এখনো অনেক দূর। এই বড় মাঠটা পার হতে হবে, জনপ্রাণী নেই— এই সন্দের সময় মাঠে কেউ দেখবার নেই।

কেন গোপাল আমায় তাড়িয়ে দিলে বোর্ডিং থেকে? —আমার ভয়ানক জ্বর এসেচে। আবার জ্বর এসেচে কেউটেপাড়া কতদূর? চোখে যেন সর্ষের ক্ষেত দেখচি চারদিকে। পুরুতঠাকুরের স্ত্রী রাগ করে বলেচেন—মাগো, ছেলেটার শুধু জ্বর আর জ্বর। পরের আপদ কে দেখাশুনো করে, আজই বিদেয় করে দাও।

ননী মাস্টার বলচে—ওর পা ফুলেচে, ও বাঁচবে না। ও এবার যাবে।

ডানদিকে একটা বড় আমগাছ রাস্তার ধারে। ওইখানে একটু শুয়ে জিরিয়ে নেবো? আর এক দাগ ওষুধ খাবো? আর হাঁটতে পারচিনে—ভীষণ জ্বর এসেচে।

হঠাৎ আমার মনে হল ওই আমতলাতেই মা আঁচল বিছিয়ে বসে আছেন। আমি আসবো বলেই কখন থেকে বসে আছেন। মা এগিয়ে এসেচেন আমায় নিতে।

আমি টলতে টলতে মার কোলে শুয়ে পড়ি। মাথায় একটা কিসের চোট লাগলো। তারপর আমার আর জ্ঞান নেই। অন্ধকার নামলো মাঠে।